৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

বাংলাদেশ : ২ + গণিত : ১

মোট সময় : ২ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

বাংলাদেশ-২

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : **নম্বর** ৫×১০ = ৫০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ৬.৫ - ৭ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৩ - ৪, এভারেজ নম্বর ৪.৫ - ৫.৫।

iii. প্রশ্নের উত্তরে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সঠিকভাবে লিখলে ভাল নম্বর পাবে।

iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।

v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

১. সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ কী কী?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের মতে- "কোন রাষ্ট্র নিজেকে পরিচালনার জন্য যে পথ বেছে নেয় তাই সংবিধান।"

সি.এফ.ষ্ট্রং সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সংবিধান হচ্ছে সেই সকল নিয়মের সমষ্টি যা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দু'য়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।"

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন ও পবিত্র দলিল। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ হচেছ সরকার। সংবিধান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। এটা সরকারের বিভিন্ন-বিভাগ, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণও বলা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭) এ ধরনের বেশ কিছু মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হল–

২৭। **আইনের দৃষ্টিতে সমতা :** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। **ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য :**

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

২৯। **সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা :**

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩০। **বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ :** রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

৩১। **আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার :** আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২। **জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ :** আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৩। **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ :** গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩৪। **জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৫। **বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ :** (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

৩৬। **চলাফেরার স্বাধীনতা :** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৭। **সমাবেশের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

৩৯। **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা :**

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪০। **পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা :** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

৪১। **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

৪২। **সম্পত্তির অধিকার :** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

৪৩। **গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ :** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে।

৪৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ :** এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪৫। **শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন :** কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৪৬। **দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা :** এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

৪৭। **কতিপয় আইনের হেফাজত :** নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

২. **বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানের 'জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' এই মূলনীতিগুলো কীভাবে মতাদর্শিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তা পর্যালোচনা করুন।**

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', এবং 'সমাজতন্ত্র'-এর অন্তর্ভুক্তি কীভাবে রাষ্ট্রের প্রায় ৫৪ বছরের যাত্রাপথে মতাদর্শিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে, তা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হলো। এই মূলনীতিগুলো জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তি হওয়ার পরিবর্তে জনবিভক্তির প্রধান উপাদান হিসেবে দৃশ্যমান হয়েছে।

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদ :

* **বর্ণবাদী আচরণ ও বিভাজন :** সংবিধানে 'জাতীয়তাবাদ'কে মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৭২ সালে। তবে এই 'জাতীয়তাবাদ' বাঙালি জাতিসত্তাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা শুরু থেকেই মতাদর্শিক বিভাজনের বীজ বপন করে।
* **অন্তর্ভুক্তির অভাব :** বাংলাদেশে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্যান্য বহু জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। রাষ্ট্র গঠনের সময় অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচয়কাঠামো দরকার হলেও, সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠের 'জাতীয়তা'কে প্রাধান্য দিয়েছে।
* **'আদি ভুল' ও 'উদ্ভট' সংশোধন :** মূল সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেওয়া এই 'আদি ভুল' পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমানের আমলে নাগরিকত্বকে 'বাংলাদেশি' হিসেবে পরিবর্তন করে কিছুটা সমাধান করা হয়। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন'— এই উদ্ভট এবং গোঁজামিলের সংযোজন করে মতাদর্শিক বিভক্তিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে।
* বর্ণবাদী আচরণের ভিত্তি: এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফলস্বরূপ পাহাড় ও সমতলের জাতিগোষ্ঠী এবং বিহারিদের সঙ্গে বাঙালিদের বর্ণবাদী আচরণ ও আধিপত্য বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। এই মতাদর্শিক বিভাজন অন্যদের অধস্তন করে রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাঙালি জাতিবাদের 'প্রায় বর্ণবাদী' স্বরূপকে দৃশ্যমান করে।
* ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য: স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (১৯৭১) বাঙালি জাতির কথা ছিল না, ছিল 'বাংলাদেশের জনগণ' (পিপলস অব বাংলাদেশ)। কিন্তু সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মূলনীতি করায় তা জনরায় বা রাষ্ট্রের প্রথম দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে।

২. ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র :

* **জন-অভিপ্রায় বর্জিত 'মুজিববাদ' :** ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে জন-অভিপ্রায় ছাড়াই সংবিধানে যুক্ত করা হয়। এই মূলনীতি দুটিকে বড়জোর 'যুদ্ধ-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার তথা মুজিবের রাষ্ট্রদর্শন' বা একত্রে 'মুজিববাদ' বলা যেতে পারে, যা জাতীয় বিভাজন সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করেছে।
* **জনম্যান্ডেটের অভাব :** শেখ মুজিব সরকারের একমাত্র ম্যান্ডেট ছিল ১৯৭০-এর নির্বাচন, যার মেনিফেস্টো ছয় দফা-তে এই মূলনীতিগুলো ছিল না। এমনকি গণ-অভ্যুত্থানের ১১ দফা-তেও এদের উল্লেখ ছিল না। উপরন্তু, '৭০-এর নির্বাচন যে 'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (এলএফও) মেনে হয়েছিল, তাতে বিজয়ী দলের পাকিস্তানে একটি সাংবিধানিক ইসলামি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা ছিল।

* **ব্যক্তির খামখেয়ালিপনা :** ঠিক যেমন ভারতে ইন্দিরা গান্ধী জনদাবি ছাড়াই জরুরি অবস্থার সময় ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংবিধানে এনেছিলেন, তেমনি জন-অভিপ্রায় ব্যতিরেকেই শেখ মুজিব এগুলো বাংলাদেশের সংবিধানে যুক্ত করেন।
* **ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি :** ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশের কারও কারও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ, তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা সঙ্গত মনে করেননি।
* **পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি :** এই জন-অভিপ্রায় বর্জিত ভাবাদর্শগুলো সংবিধানে যুক্ত করার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহ', মূলনীতিতে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের অন্তর্ভুক্তির কারণ হিসেবে কাজ করে। এই পাল্টা সংযোজনগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের মধ্যে আবার নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
* ধারণাগত বাহুল্য: সংবিধান গবেষকদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাশ্রিত বিধানগুলো মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৩ থেকে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদগুলোতে পূর্ব থেকেই ছিল। ফলে, মূলনীতি হিসেবে এগুলো যুক্ত করা ধারণাগতভাবেই বাহুল্য ছিল এবং গণতন্ত্রের নীতিকে ক্ষুণ্ণ করার শামিল ছিল।

৩. মতাদর্শিক প্রতারণা ও বিভাজনকে হাতিয়ার বানানো :

* শেখ হাসিনার শাসনামলে এই মতাদর্শিক বিভাজনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
* মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হাতিয়ার: যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হওয়ার কথা ছিল জাতীয় মতৈক্যের ভিত্তি, শেখ হাসিনার শাসনামলে সেটাকেই জাতীয় বিভক্তির প্রধান হাতিয়ার বানানো হয়েছিল।
* দুই মেরুতে জনগণকে স্থাপন: ক্ষমতাসীন সরকার মতাদর্শিক প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের দুটি অংশকে রণংদেহী অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিল। একদিকে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম বহাল রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সন্তুষ্ট রাখা হয়, অন্যদিকে জনগণের অপর অংশের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুলা হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই কৌশল সরকারকে বিবদমান দুই পক্ষের কাছেই 'ত্রাতা' হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

উপসংহার : বাংলাদেশের সংবিধানে 'জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ছিল বিতর্কিত, জন-অভিপ্রায় বর্জিত এবং অপরিহার্য নয়। এই মূলনীতিগুলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের পরিবর্তে বাঙালি-অবাঙালি, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ—এই তিন মেরুতে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শকে বিভক্ত করেছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা তথা সাংবিধানিক কাঠামোগত বিপত্তির অন্যতম কারণ।

৩. দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ কী? দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন। বাংলাদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ চালু হলে তা কতটা ভারসাম্য আনতে পারবে বলে আপনি মনে করেন।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ (Bicameral Parliament) হলো এমন একটি আইনসভা বা সংসদ, যেখানে আইন প্রণয়নের জন্য দুটি কক্ষ বা পরিষদ থাকে। এই দুটি কক্ষ সাধারণত একটি নিম্নকক্ষ (Lower House) এবং একটি উচ্চকক্ষ (Upper House) নিয়ে গঠিত হয়।

- নিম্নকক্ষ: সাধারণত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় এবং আইন প্রণয়নে এর ক্ষমতা বেশি থাকে। একে জনপ্রতিনিধিত্বের কক্ষও বলা হয়। (যেমন ভারতে: লোকসভা, আমেরিকায়: হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস)।
- উচ্চকক্ষ: এর সদস্যরা সাধারণত মনোনীত, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত বা নির্দিষ্ট পেশাজীবী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়। এটি নিম্নকক্ষের তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা ও সংশোধন করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। (যেমন ভারতে: রাজ্যসভা, আমেরিকায়: সিনেট)।

বিশ্বের অনেক দেশেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ রয়েছে (যেমন- ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি)।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিচে দেওয়া হলো :

সুবিধা (Advantages):

1. **ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা (Check and Balance):** এটি সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধ করে। নিম্নকক্ষ কোনো জনস্বার্থ বিরোধী আইন বা হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে উচ্চকক্ষ তা পর্যালোচনা, সংশোধন বা বিলম্বিত করে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।
2. **পর্যালোচনা ও সংশোধন (Review and Revision):** উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের দ্বারা তাড়াহুড়ো করে পাস হওয়া আইনগুলো বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও সংশোধন করার সুযোগ পায়, যা আইনের গুণগত মান উন্নত করে।
3. **বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব (Representation of Diverse Interests):** উচ্চকক্ষে বিভিন্ন পেশার (শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি) অভিজ্ঞ এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। ফলে, নিম্নকক্ষের সাধারণ জনপ্রতিনিধিদের বাইরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে।
4. **অল্প-জনসংখ্যার বা ফেডারেল রাষ্ট্রের সুরক্ষা :** ফেডারেল রাষ্ট্রগুলিতে (যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো) উচ্চকক্ষ ছোট ছোট প্রদেশ বা কম জনসংখ্যার রাজ্যগুলোর স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অসুবিধা (Disadvantages):

1. **আইন প্রণয়নে বিলম্ব (Delay in Legislation):** দুটি কক্ষের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা উচ্চকক্ষ আইন পাসে অতিরিক্ত সময় নিলে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে, যা দ্রুত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
2. **দায়িত্ব বিভক্তিকরণ (Division of Responsibility):** দুটি কক্ষের কারণে আইন প্রণয়নের সঠিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হতে পারে এবং দুই কক্ষের মধ্যে বিরোধ বা অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে প্রশাসন ব্যবস্থার গতি কমে আসে।
3. **অগণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি (Undemocratic Composition):** অনেক দেশে উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন বা মনোনয়ন পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক হতে পারে, যেখানে তারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না, ফলে তাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
4. **ব্যয়বহুলতা (Expensive):** দুটি পৃথক কক্ষ পরিচালনা করা, তাদের সদস্যদের বেতন ও ভাতা প্রদান এবং অতিরিক্ত অবকাঠামো বজায় রাখা এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের তুলনায় অধিক ব্যয়বহুল।
5. **শ্রেণিস্বার্থ প্রাধান্য (Dominance of Class Interest):** ঐতিহাসিকভাবে অনেক দেশে উচ্চকক্ষ রক্ষণশীল বা বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে, যা সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিপরীতে যেতে পারে।

ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা :

সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থা বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার কাঠামোগত দুর্বলতা ও নির্বাহী বিভাগের একচ্ছত্র আধিপত্য মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ হতে পারে। এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যই হলো সংসদে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ ঠেকানো।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ নিম্নোক্ত দিকগুলোতে ভারসাম্য আনতে সহায়ক হবে-

১. **ক্ষমতার তত্ত্বাবধান :** উচ্চকক্ষকে একটি 'অতিরিক্ত তত্ত্বাবধানমূলক স্তর' হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এককক্ষীয় ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের আধিপত্যের ফলে অর্থপূর্ণ সংসদীয় আলোচনা ও যাচাই-বাছাই সীমিত হয়েছে। উচ্চকক্ষের মাধ্যমে বিল পর্যালোচনা, সাময়িকভাবে বিল আটকে রাখা এবং সংশোধনের সুপারিশ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে, যা হঠকারী ও জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়নকে বাধা দেবে।

২. **আইনের গুণগত মান বৃদ্ধি :** উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষ দ্বারা দ্রুত ও অপর্যাপ্ত পর্যালোচনা ছাড়াই পাস করা বিলগুলোর ওপর আরও নিবিড় বিশ্লেষণ করতে পারবে। যদিও উচ্চকক্ষের বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারার ক্ষমতা নেই (সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে দুই মাসের বেশি আটকে রাখলে অনুমোদিত বলে গণ্য হবে), তবুও এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ভালো আইন তৈরিতে এবং দুর্বল বিধানগুলো দূর করতে সহায়ক হবে।

৩. **সংবিধান সংশোধনে জাতীয় ঐকমত্য :** সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্যের হাতিয়ার। এই ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন লাগবে। এর অর্থ হলো, সরকারি দলের পক্ষে এককভাবে সংবিধান সংশোধন করা অসম্ভব হবে। ফলে, দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে শাসক দলকে অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করে এক ধরনের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সাংবিধানিক স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করবে।

ভারসাম্যের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ : ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সফলতা নির্ভর করবে উচ্চকক্ষের নির্বাচনপদ্ধতি ও ক্ষমতাকাঠামোর ওপর। এই দুটি বিষয়েই বড় ধরনের মতবিরোধ রয়েছে-

১. **নির্বাচন পদ্ধতির ভিন্নতা :**

* **পিআর পদ্ধতি (ভারসাম্যমূলক) :** সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী উচ্চকক্ষে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) পদ্ধতি চালু হলে, সেখানে কোনো দলের একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। নিম্নকক্ষে আসন না পেলেও ভোটের অনুপাতে ছোট দলগুলোও প্রতিনিধিত্ব পাবে। ফলে উচ্চকক্ষটি 'ভারসাম্যমূলক' এবং তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এই পদ্ধতিই কার্যকর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

* **নিম্নকক্ষের আসনের ভিত্তিতে বণ্টন (ভারসাম্যহীন) :** প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন করা হলে উচ্চকক্ষটি হবে নিম্নকক্ষের 'হুবহু অনুলিপি' (Replica)। এতে নিম্নকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে উচ্চকক্ষেও তা থাকবে, ফলে ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

২. **ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা :** সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষকে স্থায়ীভাবে আইন আটকানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এটি কেবল পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং সাময়িকভাবে বিলম্বিত করতে পারবে। এই 'আলংকারিক' ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসক দলের ওপর চূড়ান্ত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। উচ্চকক্ষকে শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন বিলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধানের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি হলেও অন্যান্য জনস্বার্থ বিরোধী আইন ঠেকাতে তা যথেষ্ট হবে না।

উপসংহার : বাংলাদেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু হলে তা নিঃসন্দেহে বিদ্যমান এককক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থার চেয়ে বেশি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, বিশেষ করে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে। তবে, এই ভারসাম্যের মাত্রা নির্ভর করবে উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতির ওপর। যদি এটি সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) পদ্ধতিতে গঠিত হয়, তবে এটি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধে একটি কার্যকর 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করবে। অন্যথায়, নিম্নকক্ষের আধিপত্য উচ্চকক্ষেও প্রতিফলিত হলে, ক্ষমতার প্রকৃত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে। তাই, কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হলে উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতিকে অবশ্যই এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে তা ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

৪. **পিআর পদ্ধতির নির্বাচন কী? বাংলাদেশের জন্য পিআর পদ্ধতির নির্বাচন কতটা যৌক্তিক? আলোচনা করুন।**

PR বা Proportional Representation হলো এমন এক নির্বাচনী পদ্ধতি, যেখানে একটি দল বা প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পায়, সে অনুপাতে সংসদ বা আইনসভায় আসন পায়। এ পদ্ধতির মূল ধারণা "ভোটের অনুপাতে আসন বণ্টন"। অর্থাৎ ২০% ভোট পেলে দলটি ২০% আসন পাবে, তা সে একটি আসনেও সরাসরি বিজয়ী হোক বা না হোক। এই পদ্ধতিতে সাধারণত মাল্টি-মেম্বার কনস্টিটুয়েন্সি ও দলভিত্তিক ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রোপোশনাল রিপ্রেজেন্টেশন-এর ধারণার উদ্ভব হয় ১৮৩০-এর দশকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে, যখন সমাজে ছোট দল ও সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব না পাওয়ার বিরুদ্ধে একধরনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে আধুনিকভাবে প্রথমবারের মতো PR পদ্ধতি চালু করে বেলজিয়াম। পরে এটি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ছিল জরুরি।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক শব্দগুলোর একটি পি.আর. (PR) বা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময় থেকে এই পদ্ধতিটি নিয়ে রাজনৈতিক, একাডেমিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই এটিকে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির নতুন পথ হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে এটিকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার এক নব রূপ বলে সতর্ক করছেন। পি.আর. পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো- ভোটের হার অনুযায়ী আসন বণ্টন হয়, মাল্টি-মেম্বার কনস্টিটুয়েন্সি থাকে, দলভিত্তিক তালিকা ভোটাররা বেছে নেয়, ছোট দলগুলোও সুযোগ পায় সংসদে প্রবেশের, ভোটার ও প্রার্থীর সরাসরি সম্পর্ক তুলনামূলক দুর্বল হয়।

পি. আর. পদ্ধতির সুবিধা :

১. ভোটের প্রতিফলন নিশ্চিত হয় কোনো ভোট "নষ্ট" হয় না।

২. সংখ্যালঘু, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক দলগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ে।

৩. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কমে, আলোচনা ও সমঝোতা ভিত্তিক শাসন হয়।

৪. রাজনৈতিক বৈচিত্র্য উঠে আসে, একক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ কমে যায়।

৫. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নির্বাচন সহজ হয়।

পি আর পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ :

১. দুর্বল ও জটিল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়, যা কার্যকারিতা কমায়।
২. নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়, বা কোনো সিদ্ধান্তই হয় না।
৩. উগ্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীও বৈধতা পায় সংসদে, রাষ্ট্রের ঐক্য প্রশ্নের মুখে পড়ে।
৪. নেতা ও জনতার সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, দলই সব সিদ্ধান্ত নেয়।
৫. রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে, ঘনঘন সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্য দিয়ে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের যথাযথ প্রতিফলন থাকে, যেখানে ভোটারের প্রতিটি ভোট প্রার্থী বা দল হেরে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে এফপিটিপি ব্যবস্থায় সেটি থাকে না। এ কারণেই ছোট দলগুলোর জন্য পিআর পদ্ধতি একটি কার্যকর ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়।

তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যকর একটি পদ্ধতি। অনেক দেশেই এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এখানে আমাদের এ-ও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের মতো একটি দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতায় পিআর পদ্ধতি যথাযথভাবে কাজ করবে কি না, সে বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। তা না হলে হুট করে আবেগের বশবর্তী হয়ে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি নামের একটি নতুন ব্যবস্থার প্রচলন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেমন দুর্বল নির্বাচন কমিশন এবং বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একদমই সহায়ক নয়। যেখানে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে হঠাৎ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে পিআরের মতো একটি নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক কাঠামো বাংলাদেশের সামনে নেই।

এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক সংস্কার। আমরা যদি গত এক বছরের অধিক সময়ের রাষ্ট্র পরিচালনার দিকে তাকাই, তাহলে সংস্কার নিয়ে আমাদের খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো ইঙ্গিত মেলে না। আবার রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্য না এলে এ ধরনের একটি ব্যবস্থা আমাদের জন্য ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে না। পাশাপাশি এ বিষয়ে দক্ষ জনবল প্রয়োজন, যা স্বল্প সময়ে তৈরি করা করাও অসম্ভব।

৫. **টীকা লিখুন (যে-কোনো দুইটি) :**

ক. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল বা ইলেকশন অবজারভেশন টিম হলো এমন একটি নিরপেক্ষ গোষ্ঠী যারা কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনটি মুক্ত, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। এই দলগুলো দেশীয় (যেমন বাংলাদেশের স্থানীয় এনজিও, নাগরিক সমাজ) বা আন্তর্জাতিক (যেমন জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ) সংস্থা দ্বারা গঠিত হতে পারে এবং তারা নির্বাচনী আইন ও বিধিনিষেধের যথাযথ প্রয়োগ, ভোটারদের হয়রানি বা ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে ভোটদানের সুযোগ এবং কোনো প্রকার জালিয়াতি বা পক্ষপাতিত্বের অনুপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার চরম অভাব থাকায়, পর্যবেক্ষকদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও গ্রহণযোগ্যতার সনদ আন্তর্জাতিক এবং দেশীয়ভাবে নির্বাচনের ফলাফলকে বৈধতা দিতে অপরিহার্য। এই দলগুলো ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সীমানা নির্ধারণ, প্রচার-প্রচারণা, ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল গণনা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নজর রাখে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন জমা দেয়, যা কেবল নির্বাচনী অনিয়ম চিহ্নিত করে না, বরং দেশের গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন এবং বিশ্ব দরবারে এর ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে; বিশেষত যখন একটি নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তখন পর্যবেক্ষক দলের চূড়ান্ত রিপোর্টই সেই নির্বাচনের নৈতিক বৈধতা নির্ধারণে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার মূল ভূমিকা বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্ধারিত। সংবিধান অনুযায়ী, এই কাউন্সিলের প্রধান কাজ হলো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অসদাচরণ বা শারীরিক/মানসিক অসামর্থ্যের কারণে অপসারণের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত ও অনুসন্ধান করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া, যার মাধ্যমে বিচারকদের জবাবদিহি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হয়। এই কাউন্সিল সাধারণত প্রধান বিচারপতি (চেয়ারম্যান) এবং আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হয়। এর কাজ বিচারকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলো সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে যাচাই-বাছাই করা, তদন্তে অসদাচরণ প্রমাণিত হলে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো এবং বিচারকদের জন্য আচরণবিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন ও তদারকি করা। তবে উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গঠিত নতুন 'সুপ্রীম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল'-এ বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন, যদিও বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত মূল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তিনি সদস্য নন। দীর্ঘ আইনি বিতর্কের পর, ২০১৪ সালে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে ফিরিয়ে নেওয়া হলেও, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তা অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষিত হয় এবং ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর আপিল বিভাগ রায় বহাল রাখার মাধ্যমে ৯৬ অনুচ্ছেদের ২ থেকে ৮ উপ-অনুচ্ছেদগুলো পুনর্বহাল করে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে চূড়ান্তভাবে ফিরে আসে, যা বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগ বা আইনসভার প্রভাবকে বহুলাংশে হ্রাস করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে।

গ. জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (আরপিও)

জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (Representation of the People Order - RPO), ১৯৭২ হলো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রণীত মূল আইনি কাঠামো, যা ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর জারি করা হয় এবং এটি নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) সংসদীয় নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি, পদ্ধতি ও ক্ষমতা নির্ধারণ করে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনার নির্দেশনা

প্রদান করে। আরপিও-র মূল ধারাগুলোর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রশাসন (যেমন রিটার্নিং অফিসারদের নিয়োগ), প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (যেমন ফৌজদারি দণ্ডপ্রাপ্ত বা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সাজাপ্রাপ্তদের অযোগ্যতা এবং আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা), মনোনয়ন প্রক্রিয়া (যেমন দল কর্তৃক চূড়ান্ত প্রার্থী নির্ধারণ) এবং নির্বাচনী ব্যয় ও আচরণ (যেমন ব্যয়সীমা ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি) সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো অধ্যায় ৬(ক)-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, যার শর্ত হিসেবে দলের গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র এবং কমিটিতে নারী সদস্যের কোটা পূরণ আবশ্যক। সময়ের সাথে সাথে, বিশেষ করে ২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এবং ২০২৩ সালের সংশোধনীতে, আরপিও-তে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে; সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা, যেমন ধারা ৯১, ৯১ (এ) ও ৯১ (এএ)-এর মাধ্যমে কমিশনকে নির্বাচনী অনিয়মের কারণে গেজেট প্রকাশের আগেই কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার মতো ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছে।

গণিত : ১

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নম্বর ৫ × ৬ = ৩০

i. ম্যাথে যে অংশে ভুল করেছে সে অংশটি ধরিয়ে দিবেন ও লাইনটি শুদ্ধ করে লিখে দিবেন প্লিজ।
ii. প্রশ্নের উত্তরে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি সঠিকভাবে লিখলে ভাল নম্বর পাবে।
iii.. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
iv. প্রতিটি প্রশ্নে মন্তব্য লিখে দিবেন প্লিজ।

১। ক. **যদি $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ (যেখানে $x \neq 0$) হয়, তবে $\left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right)$ এর মান মান বাহির করুন।** ২.৫

Sol^n : দেওয়া আছে, $x - \frac{1}{x} = \sqrt{3}$

বামপক্ষ, $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$

$= \left(\sqrt{3}\right)^2 + 2$

$= 3 + 2$

$= 5$

এখন, $x^6 + \frac{1}{x^6} = (x^2)^3 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^3$

$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^3 - 3.x^2.\frac{1}{x^2}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = (5)^3 - 3 \times 5 = 125 - 15 = 110$

খ. **উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন : $2b^2c^2 + 2c^2a^2 + 2a^2b^2 - a^4 - b^4 - c^4$**

Sol^n : $2b^2c^2 + 2c^2a^2 + 2a^2b^2 - a^4 - b^4 - c^4$

$= a^2b^2 + a^2c^2 - a^4 + 2a^2bc - b^4 - b^2c^2 + a^2b^2 - 2b^3c - b^2c^2 - c^4 + a^2c^2 - 2bc^3 + 2b^3c + 2bc^3 - 2a^2bc + 4b^2c^2$

$= a^2(b^2 + c^2 - a^2 + 2bc) - b^2(b^2 + c^2 - a^2 + 2bc) - c^2(b^2 + c^2 - a^2 + 2bc) + 2bc(b^2 + c^2 - a^2 + 2bc)$

$= (b^2 + c^2 - a^2 + 2bc)(a^2 - b^2 - c^2 + 2bc)$

$= (ab + ac - a^2 + b^2 + bc - ab + bc + c^2 - ac)(ac + bc - c^2 + a^2 + ab - ac - ab - b^2 + bc)$

$= \{a(b + c - a) + b(b + c - a) + c(b + c - a)\}\{c(a + b - c) + a(a + b - c) - b(a + b - c)\}$

$= (b + c - a)(a + b + c)(a + b - c)(c + a - b)$

২। **একটি স্কুল পরীক্ষায় ৭০% পরীক্ষার্থী গণিতে এবং ৮০% পরীক্ষার্থী বাংলায় পাস করে। কিন্তু ১০% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করে। যদি ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাস করে তাহলে কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল?**
৫

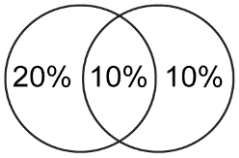

সমাধান : দেয়া আছে, উভয় ফেল করে = ১০%
গণিতে পাস করে = ৭০%
∴ গণিতে ফেল করে = (১০০ - ৭০%)
= ৩০%

∴ শুধু গণিতে ফেল করে (৩০ - ১০)% = ২০%

আবার, বাংলায় পাস করে = ৮০%

∴ বাংলা পাস করে= (১০০ - ৮০)% = ২০%

∴ শুধু গণিতে ফেল করে = (২০-১০)% =১০%
∴ যে কোনো বিষয়ে বা উভয় বিষয়ে মোট ফেল করে

উভয় বিষয়ে মোট পাস করে = (১০০-৪০)% = ৬০%
এখন, উভয় বিষয়ে ৬০ জন পরীক্ষার্থী পাস করলে পরীক্ষার্থী ১০০ জন

উভয় বিষয়ে ১ জন পরীক্ষার্থী পাস করলে পরীক্ষার্থী = $\frac{১০০}{৬০}$ জন

উভয় বিষয়ে ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী পাস করলে পরীক্ষার্থী

$= \frac{১০০ \times ৩৬০}{৬০}$ জন = ৬০০ জন

= (২০+ ১০ + ১০)% = ৪০%

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা =৬০০ জন। **(Ans)**

৩। ক. **সমাধান করুন : $4^{1+x} + 4^{1-x} = 10$**

Sol^n: $4^{1+x} + 4^{1-x} = 10$

বা, $4.4^x + \frac{4}{4^x} = 10$ [$\because a^{m+n} = a^m.a^n$ এবং $a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$]

বা, $4.4^x.4^x + 4 = 10.4^x$ [উভয় পক্ষকে 4^x দ্বারা গুণ করে]

বা, $4a^2 - 10a + 4 = 0$ [$4^x = a$ ধরে]

বা, $4a^2 - 8a - 2a + 4 = 0$

বা, $4a(a-2) - 2(a-2) = 0$

বা, $(a-2)(4a-2) = 0$

বা, $(4^x - 2)(4.4^x - 2) = 0$

হয়, $4^x - 2 = 0$ অথবা, $(4.4^x - 2) = 0$

বা, $2^{2x} = 2^1$ বা, $2^2.2^{2x} = 2$

বা, $2x = 1$ বা, $2^{2x+2} = 2^1$.

বা, $x = \frac{1}{2}$ বা, $2x + 2 = 1$ বা, $2x = -1$ $\therefore x = -\frac{1}{2}$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $x = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

খ. **$\log_{10}\left[98 + \sqrt{x^2 - 12x + 36}\right] = 2$ হলে x এর মান নির্ণয় করুন।**

Sol^n: দেয়া আছে, $\log_{10}\left[98 + \sqrt{x^2 - 12x + 36}\right] = 2$

বা, $98 + \sqrt{x^2 - 12x + 36} = (10)^2$ [$\because x = \log_a N$ হলে $a^x = N$]

বা, $\sqrt{x^2 - 12x + 36} = 100 - 98$

বা, $\left(\sqrt{x^2 - 12x + 36}\right)^2 = (2)^2$ [উভয় পক্ষে বর্গ করে]

বা, $x^2 - 12x + 36 = 4$

বা, $x^2 - 12x + 32 = 0$

বা, $x^2 - 8x - 4x + 32 = 0$

বা, $x(x-8) - 4(x-8) = 0$

বা, $(x-8)(x-4) = 0$

হয় $x - 8 = 0$ অথবা $x - 4 = 0$

$\therefore x = 8$ $\therefore x = 4$

$\therefore x = 4, 8$

৪। ক. **Mathematics শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে মোট কতভাবে সাজানো যাবে?** ২.৫

Sol^n : Mathematics শব্দটিতে মোট বর্ণ আছে 11টি

Vowel চারটিকে 1 টি ধরে মোট বর্ণ 8টি

$\boxed{\text{AEAI}}$ MTHMTCS

8 টি বর্ণকে সাজানো যায় $= \frac{8!}{2! \times 2!}$ [T = 2টি, M = 2টি]

$= 10080$

Vowel চারটিকে সাজানো যায় $= \frac{4!}{2!}$ [A = 2 টি] = 12

$\therefore$ একত্রে রেখে বিন্যাস $= 10080 \times 12 = 120960$

খ. **একটি ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলিতে 8 জন পুরুষ ও 6 জন মহিলা আছেন। ঐ পরিচালকমন্ডলির সদস্যদের মধ্য থেকে 5 জন পুরুষ ও 3 জন মহিলা সমন্বয়ে কত রকমে একটি সাব-কমিটি গঠন করা যেতে পারে?** ২.৫

Sol^n: 8 জন পুরুষের মধ্য থেকে 5 জন পুরুষ ${}^8c_5$ উপায়ে বাছাই করা যায়।

আবার, 6 জন মহিলার মধ্য থেকে 3 জন মহিলা ${}^6c_3$ উপায়ে বাছাই করা যায়।

$\therefore$ সাব কমিটির মোট সংখ্যা $= {}^8c_5 \times {}^6c_3 = 56 \times 20 = 1120$

৫। ক. **সমাধান করুন : $\frac{x-2}{x+2} + \frac{6(x-2)}{x-6} = 1$**

Sol^n: $\frac{x-2}{x+2} + \frac{6(x-2)}{x-6} = 1$

বা, $\frac{6(x-2)}{x-6} = 1 - \frac{x-2}{x+2}$

বা, $\frac{6(x-2)}{x-6} = \frac{x+2-(x-2)}{x+2}$

বা, $\frac{6(x-2)}{x-6} = \frac{x+2-x+2}{x+2}$

বা, $\frac{6(x-6)}{x-6} = \frac{4}{x+2}$

বা, $\frac{3(x-2)}{x-6} = \frac{2}{x+2}$

বা, $3(x+2)(x-2) = 2(x-6)$

বা, $3(x^2-4) = 2x-12$

বা, $3x^2 - 12 - 2x + 12 = 0$

বা, $3x^2 - 2x = 0$

বা, $x(3x-2) = 0$

হয় $x = 0 \therefore x = 0$ অথবা, $3x - 2 = 0$ বা, $3x = 2$ বা, $x = \frac{2}{3}$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $x = 0, \frac{2}{3}$

খ. $x^2 - 6x - 7 > 0$ অসমতাটির সমাধান করুন। ২.৫

সমাধান : দেওয়া আছে, $x^2 - 6x - 7 > 0$

$\Rightarrow x^2 - 7x + x - 7 > 0$

$\Rightarrow x(x-7) + 1(x-7) > 0$

$\Rightarrow (x-7)(x+1) > 0$

প্রদত্ত অসমতাটি সত্য হবে যদিও কেবল উৎপাদক দুটির উভয়ই ধণাত্মক অথবা উভয়ই ঋণাত্মক হয়।

এখন, $x-7 > 0$ অথবা, $x - 7 < 0$

$\Rightarrow x > 7$ $\Rightarrow x < 7$

আবার, $x + 1 > 0$ অথবা, $x + 1 < 0$

$\Rightarrow x > -1$ $\Rightarrow x < -1$

$x > 7$ হলে $(x-7)(x+1)$ উভয়ই ধনাত্মক হবে।

$x < -1$ হলে $(x-7)(x+1)$ উভয়ই ঋণাত্মক হবে।

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $x > 7$ অথবা, $x < -1$

৬। **রাতুলের বাংলা পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{5}$, বাংলা ও ইংরেজি দুইটিতেই পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{3}{4}$ এবং দুইটির যে কোন একটিতে পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{7}{8}$ হলে তার কেবল ইংরেজিতে পাসের সম্ভাব্যতা কত?** ৫

Sol^n: ধরি,

বাংলা পাসের সম্ভাবনা B

ইংরেজিতে পাসের সম্ভাবনা E

$P(B) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5}$

বাংলা ও ইংরেজি দুইটিতেই পাসের সম্ভাব্যতা $P(B \cap E) = \frac{3}{4}$

দুইটির যে কোন একটিতে পাসের সম্ভাব্যতা $P(B \cup E) = \frac{7}{8}$

যেহেতু $P(B \cap E) \neq 0$ তাই ঘটনাটি অবর্জনশীল।

$\therefore P(B \cup E) = P(B) + P(E) - P(B \cap E)$

বা, $\frac{7}{8} = \frac{4}{5} + P(E) - \frac{3}{4}$

বা, $P(E) = \frac{7}{8} - \frac{4}{5} + \frac{3}{4}$

$= \frac{35 - 32 + 30}{40}$ $\therefore P(E) = \frac{33}{40}$

সুতরাং, কেবল ইংরেজিতে পাসের সম্ভাবনা $P(E) - P(B \cap E) = \frac{33}{40} - \frac{3}{4} = \frac{3}{40}$